

রহমানের মা

রণেশ দাশগুপ্ত

[লেখক-পরিচিতি : রণেশ দাশগুপ্ত ১৯১২ সালের ১২ই জানুয়ারি অবিভক্ত ভারতের আসামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকার পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। ১৯৪৮ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রেফতার হন। পাকিস্তানবিরোধী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি অনেকবার কারাবরণ করেন। সাহিত্য-চর্চায়ও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো : শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে, আলো দিয়ে আলো জ্বালা, উপন্যাসের শিল্পরূপ ইত্যাদি। ১৯৯৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।]

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছে। যারা মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন তাদের স্মৃতি তখন উড়তে শেখা পাখির বাচ্চার মতো, বুঝি তা অনন্ত ভবিষ্যতের অভিসারী। দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাছাইকরা খুনেরা যে হাজার হাজার মেয়ের সন্ত্রাস নষ্ট করেছিল তাদের বীরঙ্গনা বলা হচ্ছে এবং তারা সামাজিকভাবে সমাদর পাচ্ছেন। পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা কঙ্কাল আর কেরাটি সরিয়ে ফেলা হলেও সেগুলো কারও মন থেকে সরে যায়নি। ঢাকায় শহিদ মিনারের চত্বর থেকে শুরু করে বুড়িগঙ্গার বাঁধ পর্যন্ত রাস্তার আশেপাশে দখলদার বাহিনী আগুন লাগিয়ে যেসব এলাকা পুড়িয়ে দিয়েছিল সেগুলোর অঙ্গার তখনো যেন কালো কালো আঙুলে শহরের আকাশকে বিধছে। এই অবস্থায় ১৯৭১-এর ২৬শে মার্চের স্বাধীনতা দিবসের সমস্ত অনুষ্ঠানে ঐকান্তিকতার সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা আর বীরঙ্গনাদের সম্মানিত করা হচ্ছে। শহিদদের নামে এলাকায় এলাকায় জয়-জয়কার করা হচ্ছে। একই সঙ্গেই বিশেষভাবে সম্মান জানানো হচ্ছে শহিদদের আত্মীয়-স্বজনকেও।

মহানগরীতে সভা-সমিতির একটা বড় আকর্ষণ শহিদদের কোনো প্রিয়জনকে উপস্থিত করা। এই রেওয়াজ সামনে রেখে ঢাকার শহরতলিতে একটা মহল্লার অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণলিপিতে জানানো হয়েছিল সভায় রহমানের মা উপস্থিত থাকবেন। ৭১-এর ২৬শে মার্চের রাতে মহল্লার চব্বিশ পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলে আবদুর রহমান ইয়াহিয়া খানের সাজোয়া বাহিনীর বিশাল ঢলের সামনে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল বড় রাস্তার ভাঙাচোরা নানারকম জিনিসপত্র দিয়ে তৈরি একটা ব্যারিকেডের পেছনে। বলা বাহুল্য, প্রাণ দিয়েছিল। তার প্রৌঢ় মাকে এতদিন মহল্লার সবাই চুপি চুপি সান্ত্বনা জানিয়ে আসছিল। স্বাধীনতার পরে আর সান্ত্বনা নয়। এবার সম্মান বীরের মা হিসেবে পাওনা।

একটা স্কুলবাড়ির আঙিনায় চেয়ার পেতে সভা। স্কুলের বারান্দায় মঞ্চ। তার সামনের চেয়ারগুলোতে মহল্লার গণ্যমান্য পুরুষেরা। মঞ্চের প্রধান অতিথি হিসেবে একজন নামকরা লোকের চেয়ারের পাশে সভাপতির চেয়ার, তার পাশেই রহমানের মায়ের জন্য চেয়ার। মঞ্চের টেবিলে একটা সদ্য ধোয়া সুজনির ওপর হারমোনিয়াম আর ফুলদানি। মহল্লার যে সব জোয়ান ছেলে রহমানের সঙ্গে একত্রে নানা রকম সামাজিক রাজনৈতিক কাজ করেছে, তারা ঘোরাফেরা করছে। উনিশ-কুড়ি বছরের দুটি মেয়ে রয়েছে এদের সঙ্গে।

সভা শুরু হলো। মহল্লার একজন বৃদ্ধ কোরআন থেকে পাঠ করলেন। এরপর ‘জাতীয় সংগীত’ সোনার বাংলা গাইলো স্কুলের ছেলেমেয়েরা। সভাপতি ঘোষণা করলেন রহমানের মা আসছেন। সবাই দেখলো কয়েকজন যুবক ছেলের আঙুপিছুতে রহমানের মা সভায় ঢুকছেন। একঝলকেই সবাই দেখলো তাঁকে। আপাদমস্তক বোরকায় মোড়া। পায়ে পাতলা চটি, তাদের মধ্যে শীর্ণ দুটি পা। বোরকার বাইরে দুদিকে দুটি নিরলঙ্কার হাত মাঝে মাঝে রহমানের সাথী যুবক ছেলেদের কাঁধে ভর করা। গতি ক্ষিপ্র, বারান্দায় উঠলেন কয়েক লহমার মধ্যে আঙিনায় ঠাসাঠাসি করে বসানো চেয়ারের ফাঁকগুলোকে পেরিয়ে। তাঁকে তরুণীরা চেয়ারে বসিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। প্রধান অতিথি ভাষণ দিলেন সমস্ত বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শহিদ আবদুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। সভাপতি মহল্লার বনেদি সমস্ত বাসিন্দার পক্ষ থেকে রহমানের মায়ের গৌরবের কথা বললেন একবারে ঘরোয়া ভাষায়।

বোরকায় আপাদমস্তক ঢাকা রহমানের মা কাঠের পুতুলের মতো চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে বসে বক্তৃতা শুনলেন। ডান হাতে ধরা রইল মুখের ওপর দুচোখের দুটো ছাঁদাওয়ালা আবরণীর ফালিটি। এরপরে যথারীতি গান ও কবিতা আবৃত্তি হলো। আবদুর রহমানের যুবক সাথীরা দুচার কথা বলে চাচি আম্মাকে সান্ত্বনা জানালো। অবশেষে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হলো রহমানের মাকে।

রহমানের মা কোনরকম ভূমিকা না করে বললেন, “রহমাইন্যা চাইছিল দ্যাশটারে স্বাধীন করতে। দ্যাশ স্বাধীন হইছে। এহন আপনারা দ্যাশের দশজনে যদি দ্যাশের মাইনষেরে খাওন পরন থাকন দিবার পারেন, তাইলে আপনারা আপনোগো কাম করবেন। মহল্লার মাইয়্যা ছাওয়ালগো লেহাপড়া শিখানোর এই ইস্কুলটার লাইগ্যা রহমান খাটছে। এই ইস্কুলটা যেন থাকে। আমি আমার রহমাইনারে দিছি। অরে কোলে কইরা বেওয়া হইছিলাম। এতটা ডাগর করছিলাম। আমার আর কিছু নাই। তবু কই। দ্যাশের লাইগ্যা যদি কাজে ডাকেন, আমু। আমি শহিদেদের মা। আমি রহমানের মা।”

হাততালিতে সভা জমজমাট হয়ে উঠল। এরপরেই রহমানের মা একটা অঘটন ঘটালেন। তিনি তাঁর মুখের ওপর নেমে আসা বোরকার একফালি আবরণীকে এক ঝটকায় মাথার ওপর তুলে দিয়ে সমস্ত সভার দিকে দৃষ্ট নয়নে তাকালেন। তাঁর দারিদ্র্য ও শোকে-দুঃখে শীর্ণ মুখখানিতে অপূর্ব গর্বের দীপ্তি। মহল্লার প্রবীণতমদেরও প্রতি তিনি আজ আর সংকোচ পোষণ করলেন না। পরমুহূর্তেই তিনি তাঁর পাশের তরুণী দুটিকে দুহাতে টেনে নিয়ে বারান্দা থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে কয়েক লহমার মধ্যে ঠাসাঠাসি চেয়ার আর লোক ভেদ করে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মুখের আবরণীটি মাথার ওপরেই তোলা রইল। □

শব্দার্থ ও টীকা : খুনেরা- যারা হত্যা করার জন্য প্রস্তুত। কঙ্কাল- দেহের অভ্যন্তরস্থ অস্থি। করোটি- মাথার খুলি। অঙ্গার- কয়লা। মহল্লা- শহর বা নগরের অংশ। শ্রৌট- যৌবন ও বার্ধক্যের মধ্যবর্তী বয়সপ্রাপ্ত। সুজনি- শয্যার জন্য নকশা করা বিশেষ চাদর। আপাদমস্তক- পা থেকে মাথা পর্যন্ত। নিরলঙ্কার হাত- যে হাতে অলঙ্কার পরা নেই। লহমার- মুহূর্তের। আবরণী- এখানে মুখ ঢেকে রাখার বস্ত্রখণ্ড বোঝানো হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি : গল্পটি রণেশ দাশগুপ্তের রহমানের মা ও অন্যান্য গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সব শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। বয়স্ক রহমানের মা-ও অংশগ্রহণ করেন। নিজপুত্র রহমানকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দিয়ে তিনি এই মহৎকর্মে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধ-

পরবর্তীকালে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গৃহের অভ্যন্তরে থাকা রহমানের মা প্রকাশ্যে আসেন। তিনি সবার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেন, স্বাধীন দেশে দেশগড়ায় সবাইকে সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। নারীশিক্ষার জন্য নারী-বিদ্যালয় অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, দেশের জন্য, প্রয়োজন হলে, এই অধিক বয়সেও যে-কোনো কাজ করতে তিনি প্রস্তুত। শেষে রহমানের মা গৃহের অভ্যন্তরে আর ফিরে না গিয়ে মিশে গেলেন জনতার সঙ্গে। চমৎকার এই গল্পটিতে উপস্থাপিত হয়েছে এক শহিদ জননীর সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেম। এ গল্পের ভাববস্তু হলো: মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে; মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন দেশ অর্জিত হয়েছে, কিন্তু উন্নয়নমূলক কাজ করে প্রতিনিয়ত দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

- ১। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যেসব অত্যাচার-নির্যাতন করেছিল তার একটি তালিকা কর।
- ২। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও সমাজ গঠনে তুমি কী কী কাজে অংশ নিতে পার তা লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। মুক্তিযুদ্ধে প্রাণদানকারীদের স্মৃতি কীসের মতো?

ক. উড়তে শেখা পাখির বাচ্চার মতো	খ. দৌড়াতে শেখা ঘোড়ার বাচ্চার মতো
গ. হাঁটতে শেখা বিড়ালের বাচ্চার মতো	ঘ. দাঁড়াতে শেখা মানুষের বাচ্চার মতো
- ২। এবার সম্মান বীরের মা হিসেবে পাওনা- বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

ক. রত্নগর্ভা মা	খ. নির্যাতিত মা
গ. অপমানিত মা	ঘ. চিরন্তনী মা

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠান। সেখানে অলঙ্কার হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে একজন ভাষাসৈনিককে। এতে তাঁকে সম্মানিত করা হবে এবং পাশাপাশি তরুণ প্রজন্ম উজ্জীবিত হবে।

- ৩। উদ্দীপকের আমন্ত্রিত অতিথি 'রহমানের মা' গল্পে যে চরিত্রকে ইঙ্গিত করে-
 - i একজন বৃদ্ধ
 - ii রহমানের মা
 - iii মেয়ে দুটি

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i ও iii |

৪। উদ্দীপকের সঙ্গে 'রহমানের মা' গল্পের কোন বিষয়টির সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে?

ক. শহিদ পরিবারকে পরিচিত করানো

খ. শহিদ পরিবারকে মূল্যায়ন করা

গ. অতীতের রেওয়াজ অনুসরণ

ঘ. বর্তমান ধারার রীতি অনুসরণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

'আসাদের মৃত্যুতে আমি

অশ্রুহীন; অশোক; কেননা

নয়ন কেবল ব্রজবর্ষী, কেননা

আমার বৃদ্ধ পিতার শরীরে

এখন পশুদের প্রহারের

চিহ্ন : কেননা আমার বৃদ্ধামাতার

কণ্ঠে নেই আর্ত হাহাকার, নেই

অভিসম্পাত- কেবল

দুর্মর ঘৃণার আগুন।'

ক. চেয়ার পেতে সভা বসেছিল কোথায়?

খ. 'জয়-জয়কার' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের আসাদ 'রহমানের মা' গল্পের যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে- তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকের বৃদ্ধা মাতাই যেন 'রহমানের মা' গল্পের রহমানের মা চরিত্রের প্রতিকৃতি"-
মন্তব্যটি বিচার কর।